ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2235-2242
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.486

স্বর্ণকুমারী দেবীর কথাসাহিত্যে মেয়েরা (নির্বাচিত)

সীমা সরকার, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.07.2026; Accepted: 26.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Swarnakumari Devi is notable as a prominent female writer of the 19th century. Her contribution to every branch of literature is considerable. However, it can be said without a doubt that, not in the glory of being the first in judging historical information, but in her ability to be consistant. Her works are quite important in terms of excellence. In the 19th century, Swarnakumari Devi educated in the exceptional education of the Tagore family of Jorasanka. She was one of the main figures in introducing a modern trand in Bengali literature. She possessed extraordinary talent, wrote and after another a variety of diverse literature. She wrote Songs, Poems, plays, essays, Novels, Short-stories etc. She also edited the Bengali magazine 'Bharati' at two stages.

Swarnakumari Devi established the sakhi-samiti and the Mahila Shilpashram and shilpa-Mela for the welfare of women, Service to the homeland and sense of nationalism. She was the president of the Ladies Theosophical Society. Women's education. There is no doubt that the seeds of the work Organized for the expansion and advancement of women all over the world in this Bangasamiti were planted in the ideals and methods of Swarnakumari's Sakhi-samiti. Her constructive mentality is deeply rooted in her Originated from patriotism. In addition, Swarnakumari Devi was one of the female delegates to the fifth Session of the national congrass. The renowned writer and patriot Swarnakumari was honored with the Jagattarini Gold Medal by the University of Calcutta in 1927. She will be forever remembered in the history of Bengali women's discourse for the pain and sympathy for the women Society.

Keywords: Sakhi-samiti, Mahila-shilpashram, Nationalism, women's Education, welfare of women, Patriotism, women's discourse

উনিশ শতকের নব জাগ্রত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যযুগ চালিত সমাজ ব্যবস্থার যে বহুবিধ অসঙ্গতি চোখে পড়েছিল তার থেকে বেরিয়ে আসার প্রবল সংগ্রাম থেকেই এ বঙ্গে জাতীয়তাবোধের সূচনা হয়। উনিশ শতকের বাঙালি মনে, প্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ ও আধুনিক ইউরোপের সংঘাত-সমন্বয়ের চেষ্টার ফলে জাতীয় জীবনে নবজাগরণ সম্ভব। উনিশ শতকের বঙ্গে নবজাগরণ সফল হয়েছিল কলকাতার বেশ কিছু পরিবারের সহযোগিতায়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রত্যেকটি সন্তানই ব্যক্তিত্বে ও প্রতিভায় উজ্জ্বল ছিলেন। এই পরিবারের ব্যতিক্রমী শিক্ষা ব্যবস্থার হাত ধরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ কন্যা

স্বর্ণকুমারী দেবীর বড় হয়ে ওঠা। সাংস্কৃতিক আভিজাত্যে সমৃদ্ধ পরিবারে পিতা ও অগ্রজদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মননে, চিন্তনে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

আমরা জানি কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই নয়, পৃথিবীর সব দেশে সব ভাষায় মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই বিদ্যাচর্চার ওপর পুরুষের ছিল একচ্ছত্র অধিকার। আর দেশ ও বিদেশে মেয়েরা বিদ্যাচর্চায় অংশগ্রহণ করেছে 'ব্যতিক্রমী' শব্দের আড়ালে। তবে সুদীর্ঘ পালাবদলের পরে আধুনিক যুগের সূচনালগ্নে বাংলাদেশে শিক্ষা, সাহিত্যের প্রচলিত ধারা গতিপথ পাল্টায়। আর এই নবযুগের নতুন পথে আলোর দীপবর্তিকা হাতে নিয়ে বাঙালি মেয়েদের পদসঞ্চার ঘটে বাংলা সাহিত্যে। আধুনিক যুগের সূচনালগ্নে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও বাঙালি মেয়েরা ছিল অবরোধবাসিনী। লেখালেখির সুযোগই ছিল না তাদের। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই নারী রচিত সাহিত্যের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। তখন থেকেই সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় তারা নিজেদের প্রকাশ করতে শুরু করে। উনিশ শতকের নবজাগরণের মূল প্রবাহের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নারী। রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা নিবারণ থেকে আরম্ভ করে বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ রদ, বিধবা বিবাহের সম্মতি, নারী শিক্ষার প্রবর্তন— সবকিছুর মধ্য দিয়ে সেই যুগে ইংরাজি শিক্ষা ও সহবতের সঙ্গে পরিচিত শিক্ষাবিদরা সকলেই নারী ব্যক্তিত্ব উন্মোচনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। উনিশ শতকের সেই ভাঙাগড়ার যুগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের ব্যতিক্রমী শিক্ষায় শিক্ষিত স্বর্ণকুমারী দেবীর আবির্ভাব ঘটে। পিতৃ পরিবারের উচ্চ-সংস্কৃতির উদার ও উন্নত মানসিকতায় বড় হয়ে ওঠা স্বর্ণকুমারী (১৮৫৬-১৯৩২) ছিলেন বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ধারা প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান রূপকার। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের ন'দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী একের পর এক রচনা করেছেন বহুমুখী ও বিচিত্র সব সাহিত্য। গান, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তিনি ফুল ফুটিয়েছেন অবলীলায়। প্রাক্ বিবাহ পর্বে বিদ্যানুরাগী পিতৃগৃহ এবং বিবাহের পরে শিক্ষিত স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল-এর উৎসাহ ও উদারতায় মিলেছে তাঁর সাহিত্য সাধনার অনুকূল অবসর। সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চার পাশাপাশি দুটি পর্যায়ে তিনি কালজয়ী বাংলা সাময়িক পত্রিকা 'ভারতী'র সম্পাদনা করেন। প্রথম পর্যায়ে ১৯০৮ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতী' পত্রিকা। এছাড়া ১৮৮৬ সালে নারী কল্যাণ, স্বদেশ সেবা ও জাতীয়তাবোধের লক্ষ্যে সখি সমিতি ও মহিলা শিল্পাশ্রম, শিল্পমেলার প্রতিষ্ঠা করেন স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৮২-৮৬)। তিনি লেডিস থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সভানেত্রী ছিলেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার এবং নারীজাতির উন্নতিকল্পে যে কর্মযজ্ঞের আয়োজন সারা বিশ্বজুড়ে, এই বঙ্গসমিতিতে তার বীজ উপ্ত ছিল স্বর্ণকুমারীর সখিসমিতির আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির ভিতর— এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর গঠনমূলক মানসিকতা তার গভীর স্বদেশপ্রীতি থেকে উৎসারিত। এছাড়া জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম সম্মেলনের অন্যতম মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক স্বর্ণকুমারীকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করে।

উনিশ শতকের বিশিষ্ট মহিলা সাহিত্যিক হিসেবে স্বর্ণকুমারী উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁর অবদান যথেষ্ট। তবে একথা নিদ্বির্ধায় বলা যায় যে, ঐতিহাসিক তথ্য বিচারে প্রথম হওয়ার গৌরবে নয়, স্বর্ণকুমারী স্বতন্ত্র তাঁর ধারাবাহিকতার সামর্থে। উৎকর্ষের দিক দিয়ে তাঁর রচনাগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। একথা ঠিক যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বলিষ্ঠ সাহিত্যিক যখন একের পর এক সাহিত্য রচনা করে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করছেন, যখন রবীন্দ্রপ্রতিভার তীব্র ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে— ঠিক তখনই স্বর্ণকুমারী দেবী তৈরি করে নিচ্ছেন সম্পূর্ণ নিজস্ব এক সাহিত্যজগৎ। বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিকদের রচনাধারার উৎসমুখটি লুকিয়ে আছে তাঁর কলমের আঁচড়ে। বিশিষ্ট সমলোচকের কথায়—

> "স্বর্ণকুমারীর রচনার মধ্য দিয়ে আমরা ছুঁতে পারি শতাব্দীর প্রাচীন ব্যতিক্রমী নারীমণীষাকে, চিনে নিতে পারি তাঁর সমকালকে, আর সেই সমকালকে ঘিরে তাঁর প্রত্যাশা, তাঁর অন্বেষণ আর তাঁকে অতিক্রমণের আগ্রহকে।"[১]

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের কালসীমায় সাহিত্যের সমস্ত ধারাতেই সৃজনক্ষমতার পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর সমসময়ে মহিলা লেখকদের এমন রচনা-বৈচিত্র্য ছিল না। পিতৃগৃহের সাহিত্য সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠা স্বর্ণকুমারী অল্পবয়সেই লেখনী ধরেছিলেন, যৌবনের সূচনাপর্বে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) রচনা করেন তিনি। বলাবাহুল্য উপন্যাসটি প্রশংসিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিনিধি স্থানীয়। এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> "মহিলা-ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রথম পথনির্দেশের কৃতিত্ব কাহার তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া কঠিন। তবে রচনার উৎকর্ষ ও পরিমাণের দিক দিয়া এ বিষয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।"[২]

তাঁর উপন্যাসগুলি মূলত সামাজিক ও ঐতিহাসিক এই দুইভাগে বিভক্ত। তবে এই দু'ধরনের উপন্যাস রচনায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রকে অনুসরণ করলেও যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আবার সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি রমেশচন্দ্র দত্তকে অনুসরণ করলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁকেও অতিক্রম করে গেছেন। স্বর্ণকুমারীর সামাজিক উপন্যাসগুলির বিষয় মূলত বিধবা মেয়ের জীবন-সমস্যা, অসহায় পরগৃহপালিতার বেদনার্দ্র হৃদয়ের কথা, অসহায় নারীর জীবনের জটিলতা প্রভৃতি। এসব বিষয় তিনি তাঁর উপন্যাসে সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, সেইসঙ্গে মেয়েদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দিকটিও তিনি দেখিয়েছেন। আর তাঁর ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসগুলির মধ্যে যে বিষয়টি আমাদের আকৃষ্ট করে তা হলো তাঁর স্বাদেশিকতাবোধ। তাঁর রচিত 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬), 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯), 'মিবাররাজ' (১৮৮৮), 'হুগলীর ইমামবাড়ী' (১৮৮৮), 'বিদ্রোহ' (১৮৯০), 'স্নেহলতা' ১ম ও ২য় ভাগ (১৮৯০ ও ১৮৯৩), 'ফুলের মালা' (১৮৯৫), 'কাহাকে' (১৮৯৮) এবং ত্রয়ী উপন্যাস 'বিচিত্রা' (১৯২০), 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১), 'মিলনরাত্রি' (১৯২৩) প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাস।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টিতে জীবন সম্পর্কিত কিছু নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল; কিন্তু সমাজ নিয়ন্ত্রণে পুরুষের প্রাধান্য ছিল অনিবার্য। ফলে উপন্যাসের পটভূমিতে নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখানো হলেও সম-অধিকারের প্রশ্নে তাঁরা নিরুত্তর ছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সংঘবদ্ধভাবে নারীর কিছু নিজস্ব বক্তব্য ছিল কিনা তা জানা যায় না। 'সমাচার দর্পণ'-র পৃষ্ঠায় তার কিছু প্রতিফলন হয়তো দেখা যাবে তবে সেগুলো কোনো জোরালো বক্তব্য নয়। আর দ্বিতীয়ার্ধে ঠাকুরবাড়ির উদার, মার্জিত, শিক্ষিত পরিবেশে স্বর্ণকুমারীর যে মানসিকতা গড়ে উঠেছিল, সেই শিক্ষা থেকেই নারীর বেদনাকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে নারীর আত্মশক্তির প্রতি তাঁর ছিল গভীর বিশ্বাস। সমাজ আরোপিত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে নারী তাঁর মর্যাদা ফিরে পাক, নিজ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবনকে সুন্দর করে তুলুক এটাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। তাঁর ইতিহাসপ্রীতি, উদার সমাজবোধ, সেই সঙ্গে আত্মঅন্বেষণের আগ্রহ— সব মিলিয়ে তিনি এক ভিন্নস্বাদ নিয়ে এসেছিলেন তাঁর রচনায়। এমন সর্বত্রগামী দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন স্বর্ণকুমারীকে আমরা সমাজ সচেতনতায় প্রথমা বলে চিহ্নিত করতে পারি। যুগের স্পন্দনকে উপলব্ধি করে সক্রিয় হয়েছে স্বর্ণকুমারীর নিজস্ব ভাবনা, গড়ে উঠেছে সৃষ্টিধর্মী কর্মপদ্ধতি। নতুন-পুরানোর মেলবন্ধনে আগ্রহী স্বর্ণকুমারী আজ স্বল্প পরিচিত তাঁর দেশবাসীর কাছে, বাঙালি পাঠকের কাছে।

উনিশ শতকের স্বনামধন্য সাহিত্যিক স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্পগুলিও বিষয় বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল। অধিকাংশ গল্পে লেখিকার প্রতিভা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার যুগপৎ মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। জীবনদর্শন বা জীবন সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারীর প্রসারিত দৃষ্টি এবং সুতীব্র সহানুভূতি সঞ্জাত বিপুল অভিজ্ঞতা তাঁর ছোটগল্পের চরিত্র ও কাহিনিকে আলাদা মাত্রা দান করেছে। 'মালতী' (ভারতী, মাঘ-ফাল্গুন ১২৮৬) স্বর্ণকুমারীর প্রথম গল্প। এছাড়া 'বীরেন্দ্রসিংহের রত্নলাভ' (সখা, ১৮৮৩), 'কুমার ভীমসিংহ' (ভারতী ও বালক, জৈষ্ঠ ১২৯৮), 'সন্ন্যাসী' (১২৯৩), 'লজ্জাবতী' (১২৯৮), 'পেনেপ্রীতি' (১৩০৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্প। তাঁর প্রথম গল্প সংকলন গ্রন্থ 'নবকাহিনী' (১৮৯২)। স্বর্ণকুমারী তাঁর বেশিরভাগ গল্পের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন সমাজ ও পরিচিত জীবন থেকে। আসলে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর মূল্য নির্ধারণ, নারীকে তারই জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে, সহানুভূতি সহকারে অন্তঃপুরের নারীদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবলোকন করা একমাত্র মহিলা লেখকের দ্বারাই সম্ভব। বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণকুমারীর গল্পে তারই সূচনা ও বিকাশ দেখা দিয়েছিল। বিশিষ্ট সমালোচক পশুপতি শাসমল স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্প সম্বন্ধে বলেছেন—

> "তাঁর গল্পগুলি এক বিস্মৃতপ্রায় যুগের যাদুঘর এবং স্বপ্নরঙীন ভবিষ্যতের চিত্রশালা-এবং চিরকালের রমণী সেই জগতেরই অধিবাসী।"[৩]

তাঁর প্রত্যেকটি গল্প অনন্য।

লেখক হিসেবে তিনি যেমন দেখেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীলতার গর্ভ থেকে নতুন চেতনার জাগরণ, বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহকে কেন্দ্র করে মেয়েদের দিন যাপনের অসহায়তা, আর সেই যাপিত জীবনের অধিকারহীনতাকে অনুভব করে নতুন সংবেদনার উন্মেষ; অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর সূচনা-মুহূর্ত থেকে দেখেছেন রাজনৈতিক উন্মাদনা— বঙ্গভঙ্গের অন্যায় আক্রমণ, সে অন্যায় রোধের সংগ্রাম, বয়কট আন্দোলনে স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদলের হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি কিংবা জাতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতায় নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের মতাদর্শগত বিরোধ। আর এই সব বিষয় নানা ভঙ্গিতে— কখনো গল্প-উপন্যাসে, কখনো বা প্রবন্ধে— রূপ নিয়েছে তাঁর রচনায় চিরকালীনতার সঙ্গে সঙ্গে সমকালীনতাকেও ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছে তাঁর লেখালেখি। তিনি নিজেকে কোথাও মহিলা লেখিকা বলে চিহ্নিত করেননি। সাহিত্যসৃষ্টির গতিপথে তিনি পুরুষের সমকক্ষ হয়েই চলেছেন। তাঁর 'কাহাকে' উপন্যাসের কথা যদি মনে করা যায় তাহলে দেখা যাবে এই উপন্যাসের নায়িকার আত্মজিজ্ঞাসা, স্বাধীনসত্তা সম্বন্ধে সচেতনতা সব মিলিয়ে মানবজীবনের আলোছায়ার নিত্যলীলায় প্রকাশের ব্যাকুলতা আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, সেই অনুভূতি বা ব্যাকুলতা স্বর্ণকুমারীর নিজেরও। তাঁর গল্প উপন্যাসের একটা বিরাট বড় পরিসর জুড়ে আছে মেয়েরা। স্বর্ণকুমারীর কথায়— 'পাগল' মেয়ের দল। 'ভারতী' পত্রিকায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ' লিখতে বসে একদিন লিখেছিলেন— 'যাহারা হারিবে জানিয়াও সমস্ত পণ করে, তাহারা পাগল, কিন্তু এরূপ পাগলের সংখ্যা পৃথিবীতে অল্প নহে, অন্তত অর্ধেক— নারীজাতি।' স্বর্ণকুমারী অন্তরের সহানুভূতি দিয়ে তাঁর রচনায় এই 'পাগল' মেয়েদের ব্যথা যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন। যারা সংসারে শুধু দিল, পেলে না কিছুই, আবার যারা ফুলের মতোই স্বল্প পরমায়ু নিয়ে এসেছিল জগৎ সংসারে, সুগন্ধি বিতরণ করেই চলে গেছে অচিরেই—সেই সব স্বল্পায়ু, সহজ, সরল মেয়ে তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। প্রতিদানহীন প্রেমেরই জগৎ স্বর্ণকুমারীর ছোটগল্প।

> "মেনে-নেওয়া, মানিয়ে-নেওয়া, আর সহ্য করে চলাতেই মেয়েদের লক্ষ্মীশ্রী দেখেছেন স্বর্ণকুমারী। কিন্তু প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গও অনেক সময়ই জ্বলে উঠেছে তাঁর গল্পে।"[৪]

তাঁর রচিত উপন্যাস 'ছিন্নমুকুল' এর নায়িকা কনক বা 'স্নেহলতা' উপন্যাসের নায়িকা স্নেহলতার চরিত্র এক সর্বংসহা নারীর ছাঁচে গড়া। স্বর্ণকুমারীর মনের গভীরে হয়তো কোথাও এমন শ্রীময়ী একটি মুখের আদল ছিল।

তাঁর বেশিরভাগ গল্প-উপন্যাসের কলা-কুশলী এরাই। তাঁর ছোটগল্প বৈচিত্র্যের খনি। যেমন— এক মারাঠী মেয়ের আত্মহারা ভালোবাসার সর্বোত্তম নিদর্শন 'পেনে-প্রীতি' গল্পটি। আবার তাঁর 'কেন' গল্পটি দুই নারীর ভালোবাসার প্রবলতারই কাহিনি, একই পুরুষকে ভালোবেসেও যারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হয়ে ওঠেনি, একে অপরকে না চিনেও অদৃশ্য এক সখিত্বের বাঁধনে জড়িয়েছে নিজেদের। প্রেমিক পুরুষটির ভালোবাসার কোনো নির্ধারক ভূমিকাই নেই এ গল্পে—

> "ভালোবেসেও সবল প্রত্যাখ্যানে কারো ফিরিয়ে দেওয়া আর সব জেনেও উদার ক্ষমায় কারো ফিরিয়ে নেওয়া—প্রেমিক পুরুষটি কেবল এই দেওয়া নেওয়ার ক্রীড়ানক মাত্র। পুরুষ-প্রতাপী সমাজের দুই নারী—এক পুরুষ, ছকের বেশ বিপরীত ছবি এই গল্পটি, যেখানে পুরুষটি সর্বপ্রকারে প্রতাপবিহীন।"[৫]

তাঁর 'লজ্জাবতী' নামক গল্পটি একটি লাজুক বিবাহিতা নারীর জীবনালেখ্য। এই গল্পে অভিযোগহীন, অভিমানী স্বভাবের মেয়ে লজ্জাবতীর অকালমৃত্যু আমাদের ব্যথিত করে। তার এই অকালমৃত্যুর জন্য তার অভিমানী স্বভাবের পাশাপাশি অন্য একটি কারণ তার শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ি, জা এর অবহেলা; কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো বধূনির্যাতনের চেনা ছকে গল্পটি গড়ে ওঠেনি। 'লজ্জাবতী'র অকালমৃত্যুর বেদনা ছাপিয়েও বড় হয়ে উঠেছে তার অভিমানী স্বভাব। বিনা দোষে যাকে দোষী করলেও প্রতিবাদ করে না, নীরবে চোখের জল ফেলে শুধু। এই গল্পের আর একটি দিক যা আমাদের মুগ্ধ করেছে তা হল—রায়বাঘিনী বলে বাঙালি সমাজ যাকে নিন্দিত করেছে সেই ননদিনীর সঙ্গে লাজুক ছোট্ট লজ্জাবতীর নীরব স্নেহসম্পর্কটুকু। দুই অসমবয়সী নারীর এই সখিত্বে, নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় আর লজ্জাবতীর প্রতিবাদহীন স্বভাবের মাধুর্যেই করুণ কোমল তারে বাঁধা হয়ে যায় গল্পটির অন্তর্নিহিত সুর।

'মালতী' নামক গল্পও এক নারীর আত্মবিসর্জনের কাহিনি। এই গল্পে মালতী যাকে আশৈশব দাদা বলে জেনে আসছে, যদিও রমেশ তার রক্তের সম্পর্কে দাদা নয়, তবুও সেই দাদার জীবন থেকে অ-সুখের একটি কাঁটা চিরতরে উপড়ে ফেলার জন্য, রমেশ-শোভনার যুগল জীবনকে নিশ্চিত, নির্ভার করার জন্য অকাতরে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে ছোট্ট মালতী। এই গল্পটি তাই শেষপর্যন্ত হয়ে উঠেছে— দাদা ও ছোট বোনের অকৃত্রিম স্নেহবন্ধনের গল্প।

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য-রচনার সমকালে নারীদের যে সাধারণ সামাজিক সমস্যাগুলি তাদের বিব্রত এবং আত্মমর্যাদাশূন্য, পরনির্ভর করে তুলেছিল তার একটি বাল্যবৈধব্য। সমাজপতিদের নিষ্ঠুর বিধির বলি শত শত নারী, সঙ্গে কৌলিন্য প্রথার বিষময় ফল তো আছেই, এসবের ফলে কত শত বালিকা-কুসুম অকালে ঝরে যেত তার হিসেব ছিল না। সামাজিক সংস্কারের চেনা ছকে বন্দী স্বর্ণকুমারীর গল্পের অনেক নায়িকাই। 'অমরগুচ্ছ' গল্পে বিধবা ষোড়শী মেয়েটি নিজের অনুরাগকে সম্বরণ করে অমর পুষ্পের উপহার তুলে দিয়েছে আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের নবপরিণীতা বধূর হাতে, তারপর সান্ত্বনা খুঁজেছে বিস্মৃত স্বামীর ছবির মুখশ্রীতে। আসলে প্রেম তো শুধু আকাঙ্ক্ষায় শেষ হয়ে যায় না; অনেক সময় প্রতিকারও প্রত্যাশা করে না, বিতরণেই তার আনন্দ, প্রেম সে তো নারীরই জীবন-উপাচারের অঙ্গ, স্বামীর স্মৃতি ফিরে পাবার বিষয়টি সংস্কার-আবদ্ধ জীবনের দ্যোতনা দেয়, এখান থেকে তার মুক্তি ঘটলে প্রেম সম্পূর্ণতা পেত। কিন্তু স্বর্ণকুমারী সময় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি, সমাপ্তির মধ্যে যতই বাস্তবতা থাক, প্রেমের অম্লান ধ্বজা উড্ডীন হয়নি গল্পে।

আবার 'পূজার তত্ত্ব' গল্পে শুনতে পাই মাতৃত্বের সংস্কারের চিরন্তন উচ্চারণ। পতিগৃহে পিতৃনিন্দা শুনে আর পিতৃগৃহে পতিনিন্দা শুনে সমান কাতর বাঙালি বধূর বেদনার ছবি আছে এ গল্পে। সন্তাপ-তাড়িতা সে মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে তার মা বলেছেন—

> "সহ্য করে কর্তব্য পালনেই মনুষ্যত্ব। স্ত্রী লোকেরও জীবনের উদ্দেশ্য আছে। তুমি যখন তোমার ছেলেগুলিকে মানুষ করে— প্রকৃত মানুষ করে তুলবে— তখন তোমার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।"[৬]

মাতৃত্বেই মেয়েদের চূড়ান্ত সার্থকতা— সমাজের এই দীর্ঘদিনের সংস্কারের পিছুটানকেই স্বীকার করে নিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

'সত্যি ঘটনা হইতে গৃহীত' 'যমুনা' গল্পটি এক অর্থে স্বর্ণকুমারীর গল্পমালায় পৃথক অস্তিত্বে আসীন, এই গল্পটিকে ব্যতিক্রমী গল্পও বলা যায়। এখানে পুরুষ-প্রধান সমাজে নারীর মর্মান্তিক যাতনার ইতিকথা আছে। স্বর্ণকুমারী সাহিত্যপত্র সম্পাদনায়, সখিসমিতি গঠনে, নারীর মর্যাদা রক্ষায়, স্বাদেশিকতায় অসম্মানিত নারীকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, সবসময়ে তাঁর সেই প্রচেষ্টা বিস্ময়কর। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে পড়বে 'যমুনা' গল্পটির কথা।

> "স্বর্ণকুমারীর গল্পে দীপ্ত নারী যে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন, নিজ সীমা-বিষয়ে অবহিত, আত্মমর্যাদাপূর্ণ নারীর সন্ধান করলে 'যমুনা'য় তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। স্বর্ণকুমারীর গল্পের অধিকাংশ নারীর মতো সংস্কারে নিজেকে সমর্পণ করে দেয় নি। পুরুষের বঞ্চনার জবাবে নিজসত্তার উন্মোচনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে দৃঢ়চিত্তে স্পর্ধা প্রকাশ করে পুরুষের প্রচলিত ধারার ঔদ্ধত্যকে ধূলায় নামিয়ে আনতে পেরেছে।"[৭]

স্বর্ণকুমারী দেবী তথাকথিত নারীবাদী নন, কিন্তু সমাজে নারীর যে একটি নিজস্ব দাঁড়াবার জায়গা আছে এই গল্প পাঠে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ্বাস করে ভালোবেসে যে পুরুষের স্ত্রী হয়ে একটি নিশ্চিন্ত সংসারের আশ্বাস নিয়ে পতিগৃহে গিয়ে বুঝল স্বামী তাকে স্ত্রীর মর্যাদা নয় দাসী অভিধা দিয়ে জীবনযাপনে বাধ্য করে। তখন নিদারুণ এক হৃদয় যন্ত্রণা নিয়ে সে বাড়ি থেকে একাকী বেরিয়ে পড়ে অজানার উদ্দেশ্যে। কিন্তু স্বামী এসে তাকে যখন অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার কাঁধে হাত রাখতে গেল তখন দেখা গেল বিদ্যুতের মতো সরে দাঁড়িয়ে নিজ গর্বে গর্বিত নারী তীব্র স্বরে বলল,

> "আমাকে স্পর্শ করিও না। তুমি আমার স্বামী, কিন্তু আমি তোমার পত্নী নহি— আমাকে স্পর্শ করিও না।"[৮]

আমরা বুঝতে পারি এই উক্তি সময়ের পক্ষে প্রাগ্রসর কোনো নারীরই। কাল-নিরপেক্ষ ভাবে নারীর ব্যক্তিত্ব জাগরিত হয়, যমুনা বুঝিয়ে দিয়েছে স্ত্রীকে নিয়ে পুতুলখেলার দিন অবসিত। প্রতারণা, ছলনা এবং তারপরে প্রলোভন দেখিয়ে নিজের কব্জার মধ্যে নারীকে রাখবার দিন আর নেই।

'তিনটি দৃশ্য' গল্পটি 'যমুনা' গল্পের যমুনার তীব্রতেজা রূপ থেকে অসম্ভব ব্যক্তিত্বসম্পন্নতায় পৌঁছে গেছে। যে আর্থিক বৈভবে নারীকে অসহায় প্রতিপন্ন করে, উচ্ছৃখলতায় গা ভাসানো উৎসবে মেতে ওঠে পুরুষপ্রবরেরা সেখানে দৃঢ়চিত্তে একবার রুখে দাঁড়াতে পারলে, সেই পুরুষকেই পদদলিত করা যায়, ধনিষ্ঠা বক্ষ্যমান গল্পে তারই প্রতিনিধিত্ব করেছে। এমন এক নারীর ব্যক্তিত্বের কাছে পুরুষের আত্মসমর্পণ এমন করে অন্য কোনো গল্পে কেন, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই নেই। ব্যক্তিত্বের উন্মোচনের মধ্যে নারীর ব্যক্তিত্বময়ী রূপ স্বর্ণকুমারীর রচনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পে মুখ্যত স্নিগ্ধকোমলকান্তি নারীর আনাগোনা, শান্ত রসাস্পদ জীবনই লেখিকার প্রার্থিত। কিন্তু স্বর্ণকুমারী জানেন জীবন এই একাভিমুখতায় সম্পন্ন হতে পারে না। প্রয়োজনে ব্যক্তিত্বে কঠোর, কর্মে দৃঢ়চেতা হওয়াও একান্ত প্রার্থনীয়। একারণে তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পে নারীর মোহিনী রূপের নয়, দৃঢ়তার, ব্যক্তিত্বের কঠোরতার পরিচয় বিদ্যমান। স্বর্ণকুমারী তাঁর অধিকাংশ গল্পে অসহায় অথচ শক্তিময়ী

মেয়েদের চরিত্রকে নানাদিক থেকে দেখেছেন, আর পাঠককে দেখিয়েছেন। মেয়েরাই যে মেয়েদের শত্রু— এই চলতি কথার বিপরীতে মেয়েদের পারস্পরিক ভালোবাসার শক্তি দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন সংসারের দ্বন্দ্ববহুল সম্পর্কগুলির মধ্যে থেকে তারা কিভাবে নিষ্কাশন করে নেয় ভালোবাসার অমৃতরস— অচেনা এক গৃহবধূর মায়ায় চরিত্রহীন এক মেয়ে নিঃশব্দে আর নিঃশেষে ছেড়ে দেয় তার ভালোবাসার অধিকার, ননদ- ভ্রাতৃবধূ হয়ে ওঠে পরমসখী, আশ্রিত ও আশ্রয়দাতা হয়ে ওঠে পরমবন্ধু। মেয়েদের পারস্পরিক ভালোবাসায় এমন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল বলেই তো এ গল্পগুলির স্রষ্টা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন 'সখিসমিতি'র মতো একটি নারী সম্মিলনী। সমালোচকের কথায়—

> "স্বর্ণকুমারীর গল্প মধুস্বাদী, তাঁর যে কোনো ধরনের গল্পে কোমলতার স্পর্শ পাওয়া যায়, এর সঙ্গে যোজিত স্বতঃস্ফূর্ততা। মনে হয় গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার লেখিকার অন্তঃমধ্যে স্তরে স্তরে সজ্জিত। ইতিহাস, সমকালীন সমাজজীবন, চিরন্তন সংকট, জটিলতা, ভ্রমণ-জনিত রম্য দৃশ্য, হৃদয়বত্তা, ঔদার্য, সহৃদয়তা, পরোপকারী প্রবৃত্তি, আনুগত্য ভক্তি ও বিশ্বাস-অভিজ্ঞতা, জ্ঞান পারিবারিক শিক্ষা-সংস্কৃতির অমোঘ প্রভাব নিয়ে তাঁর গল্পমালা প্রথিত।"[৯]

ইতিহাসাশ্রিত গল্পে তিনি টডকে অনুসরণ করেছেন, বিষয় বৈচিত্র্যে তাঁর গল্প ঋদ্ধ। টডকে অনুসরণ করলেও স্বর্ণকুমারীর মৌলিকতা চোখে পড়ার মতো। ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার রং মিশিয়ে অসামান্য সব গল্প লিখেছেন তিনি।

স্বর্ণকুমারীর গল্পের মতো সামাজিক উপন্যাসেও স্বাভাবিক কারণেই মেয়েদের জীবনের নানান সমস্যা, প্রেম-নির্ভরতা-বঞ্চনা-অবজ্ঞা-স্নেহকাতরতার কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। কাল ও সমাজের প্রভাবে প্রায় সকলেই নিম্নকণ্ঠ, পরিবারে আশ্রিত, অসহায়তার শিকার, নিজেদের আকাঙ্ক্ষার কথাটাও উচ্চারণ করতে অপারগ, বেদনার গোপন কোটরে সকল ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়েছে। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে প্রেমে দুর্বার হয়ে উঠতে খুব বেশি মেয়েদের দেখা যায় না। যেন পুরুষপ্রধান সমাজে মানিয়ে নেওয়াই ভবিতব্য তাদের। 'ছিন্নমুকুল', 'স্নেহলতা' প্রভৃতি উপন্যাসে আমরা যেন উপরিউক্ত বক্তব্যের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করতে পারি। তবে এ দুয়ের ব্যতিক্রম হিসেবে দেখাতে পারি তাঁর 'কাহাকে' উপন্যাসটিকে। এই উপন্যাসের নায়িকা মনি প্রচলিত রীতি-নীতির রাস্তায় না হেঁটে বিবাহের ক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। স্বাধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার হয়েছে। আসলে লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারীর কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ততা সে যুগের সমাজ বাস্তবতারই প্রতিফলন। তবু এর মধ্যেও তিনি চেষ্টা করেছেন প্রচলিত গণ্ডীর বাইরে এসে নারীর আত্মমর্যাদার প্রশ্নে জোরালো যুক্তিবিন্যাস করতে। 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' নামক একটি প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারীর নারীবাদী অবস্থানে সে যুগের প্রেক্ষিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এক পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিক ডিলানের প্রচারিত পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক যুক্তিগুলিকে যে তীব্র ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় স্বর্ণকুমারী আক্রমণ করেছেন তা নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে হাতিয়ার রূপে গণ্য হতে পারে। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকারূপে মেয়েদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাকে পত্রিকায় অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। আসলে সামগ্রিকভাবে নারী-প্রশ্নে স্বর্ণকুমারীর অবস্থান একটু বিচিত্র। পারিবারিক বাতাবরণ, প্রতীচ্যশিক্ষা, অভিস্নাত মানসিকতা-জাতীয়তাবোধে দীপ্ত রাজনৈতিক চেতনা এই মনস্বিনীকে একদিকে যেমন প্রাণিত করেছে 'ভারতী'র মতো একটি সমাজমনস্ক পত্রিকা সম্পাদনা এবং বিজ্ঞাননির্ভর প্রবন্ধ থেকে স্ত্রী শিক্ষা পর্যন্ত নানা বিষয়ে অজস্র চিন্তাশীল রচনায়, তেমনি মেয়েদের ব্যাপারে প্রচলিত সংস্কারধর্মী চিন্তার বশ্যতা থেকেও তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। সমালোচকের কথায়—

> "পুরুষতান্ত্রিকতা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রেখে শিক্ষিত পুরুষের মানসিক সঙ্গিনীরূপে নারীকে গড়ে তোলার জন্য যে স্ত্রীশিক্ষা তথা স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচলন উনিশ শতকে হয়েছিল, সেই ধারণার প্রতি সার্বিক সমর্থন না জানালেও এবং নারীর আধুনিক শিক্ষার উপযোগিতা ঘোষণা করলেও তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা তথা সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে তাঁর ভূমিকা নিয়ে কোনও বিশ্লেষণ বা প্রক্ষিপ্ত মন্তব্যও স্বর্ণকুমারীর রচনায় অনুপস্থিত।"[১০]

আসলে চির অভ্যস্ত অবরোধ প্রথার নিগড় ভেঙে বাইরের পৃথিবীর মুক্ত বাতাসে ফুসফুস ভরে শ্বাস গ্রহণ, আর সেই সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ফলে সীমিত হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসার দুর্লভ সুযোগ লাভকেই নারীর পক্ষে যথেষ্ট সৌভাগ্যের সূচক রূপে দেখেছেন তিনি। অন্যদিকে তাঁর অভিজাত শ্রেণির অবস্থানের জন্য তথাকথিত ভদ্রলোক পরিবারের মেয়েদের অবস্থা নিয়েই আলোচনা করেছেন তিনি। সমাজের নিচুতলার মেয়েরা যারা অবরোধ প্রথার যুগেও জীবিকার স্বাধীনতা ভোগ করত, তারা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এই সব টানাপোড়েন, দোলাচল বৃত্তির মধ্যে দিয়েই স্বর্ণকুমারীর যাত্রাপথের বিস্তৃতি। আধুনিক অর্থে নারীবাদী রূপে তাঁকে হয়ত চিহ্নিত করা যাবে না, তবু উনিশ শতকের নারীর স্বাধীন চেতনা উন্মেষের ঋত্বিক রূপে তিনি ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। বিশিষ্ট সমালোচক সুতপা ভট্টাচার্যের কথায়—

> "নারীবাদের একটা প্রধান দিক—নারী-পুরুষ সমতার ভাবনা, যা স্বর্ণকুমারীর লেখায় এবং তাঁর সম্পাদিত কাগজে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে উনিশ শতকে তা অদ্বিতীয়। কিন্তু নারীবাদের একটি অন্য দিকও আছে সেটা হলো নারীজাতির প্রতি সহানুভূতি—তার মঙ্গল ইচ্ছা। নারী সমাজের জন্য যে বেদনাবোধ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর, তার জন্য বাংলার নারী আলোচনার ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।"[১১]

তথ্যসূত্র:

১. সেন, অভিজিৎ। ভাদুড়ী অনিন্দিতা সংকলক। স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা সংকলন। দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অব উইমেন্স স্টাডি, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০০০, কলকাতা, ভূমিকাংশ পৃ. ১১।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা। মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯-২০১০, কলকাতা, পৃ. ১৫।

৩. শাসমল, পশুপতি। স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য। শান্তিনিকেতন, ১ম সংস্করণ, পৌষ ১৩৭৮, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৯৪।

৪. সেন, অভিজিৎ। ভাদুড়ী অনিন্দিতা সংকলক। স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা সংকলন। দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অব উইমেনস্ স্টাডিজ, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০০০, কলকাতা, ভূমিকাংশ, পৃ. ৮।

৫. তদেব, পৃ. ৯।

৬. তদেব, পৃ. ১৩১।

৭. মজুমদার, সমরেশ। স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্প। রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ৪৩।

৮. সেন, অভিজিৎ। ভাদুড়ী অনিন্দিতা, সংকলক। স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা সংকলন। দে'জ পাবলিশিং, স্কুল অব উইমেন্স স্টাডিজ, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০০০, ভূমিকাংশ, কলকাতা, পৃ. ৮।

৯. মজুমদার, সমরেশ। স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্প। রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ৪৩।

১০. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। সম্পাদিত, স্বর্ণকুমারী দেবী স্বতন্ত্র এক নারী। পূর্বা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০০, কলকাতা, পৃ. ৫৬।

১১. ভট্টাচার্য, সুতপা। মেয়েলি পাঠ। পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০০০, কলকাতা, পৃ. ১৪৩।